বাংলায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ও ঢাকার নওয়াব পরিবার

The Inter-communal Rations in Bengal and the Nawab Family of Dhaka

মোছাঃ জান্নাতে গুলশান*

Abstract: The Nawabs of Dhaka played a pivotal role in shaping the dynamics of inter-communal relations in Bengal. As the proprietors of the largest zamindari estate in Bengal, the Nawab family of Dhaka had unparalleled influence and prominence in the British administration. At the same time, through various public welfare activities, they earned a position of leadership among the general populace of the region. Utilizing their influence and power, they acted as a bridge of unity among people of all communities. The Nawab House of Dhaka (Ahsan Manzil) became the foremost centre for communal harmony and a meeting place for people of all religious backgrounds in the region. However, a divergence of views arose in 1905 between Nawab Sir Salimullah and the Indian National Congress as well as the Swadeshi movement supporters over the Partition of Bengal. Sir Salimullah supported the partition and played a leading role in the formation of the All-India Muslim League in 1906, which led to discontent among the upper-caste Hindus. Nevertheless, the Scheduled Caste Hindu communities of East Bengal extended their wholehearted support to his leadership. From Nawab Khwaja Abdul Ghani to the last titleholder Nawab Khwaja Habibullah, the Nawab family of Dhaka maintained balanced and harmonious relations among the various communities of Bengal. As a result, inter-communal relations in Dhaka and its surrounding areas (East Bengal) were more positive compared to other parts of India. However, it appears that this topic has not been adequately researched. The main objective of this article is to analyze the role of the Nawab family of Dhaka in the dynamics of inter-communal relations in Bengal.

Keywords: Bengal, Inter-communal Relations, Nawab Family of Dhaka, Communal Harmony, Bridge of Unity.

* পিএইচডি গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

কোন অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও মনোভাব সেই অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পেছনে বড় নেয়ামক হিসেবে কাজ করে। এ কারণে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের গতিপথ নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের মানসিকতা ও কার্যাবলি মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আবহমান কাল থেকে এই বাংলায় বহু সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে আসছে। যুগে যুগে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর নীতি ও প্রভাব দ্বারা এ অঞ্চলের আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ক প্রভাবিত হয়েছে। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে সুলতানি ও মুঘল শাসকগণ দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উদারনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সেসময়ে বাংলার আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ক পারস্পরিক মতদ্বৈধতা সত্ত্বেও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাংলা তথা ভারতের ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে তাদের শাসন কৌশল হিসেবে 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক সহাবস্থানের ঐতিহ্যে ব্যত্যয় ঘটায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের বৈষম্যপূর্ণ নীতি বাংলার আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ককে জটিল ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করে। উনিশ শতকে বাংলায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কে যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয় তা বিশ শতকের প্রথমার্ধে সংঘাতে রূপ নেয়।

এই সংকটকালীন সময়েই ব্রিটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক নীতির ফলস্বরূপ তাদের অনুগত শক্তি হিসেবে বাংলায় নতুন ভূস্বামী শ্রেণির উত্থান ঘটে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল ঢাকার নওয়াব পরিবার। পূর্ব বাংলার সর্ববৃহৎ জমিদারির সত্ত্বাধিকারী হিসেবে বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে এই পরিবারের অসামান্য প্রভাব ছিল।[১] সরকারের আনুগত্যের মধ্যে থেকেও মুসলিম ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে ঢাকার নওয়াব পরিবার জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলের মানুষের কল্যাণে ভূমিকা রেখেছিল। এছাড়া সাধারণ মানুষের আনন্দ বিনোদনের জন্যও নওয়াবগণ খেলাধূলা ও উৎসবের আয়োজন করতেন। নওয়াব আবদুল গনি নববর্ষ উপলক্ষ্যে শাহবাগে কুটির শিল্প ও কৃষিজ উপকরণ ও যন্ত্রপাতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতেন। সে সুবাদে এতদঞ্চলের নানা সম্প্রদায়ের সাথে তাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঢাকার নওয়াবদের আবাসিক প্রাসাদ আহসান মঞ্জিল হয়ে উঠেছিল সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মিলন মেলার প্রাণকেন্দ্র। ঢাকার নওয়াবগণ ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলার সকল সম্প্রদায়কে একটা প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূত্রপাত হয়েছিল, তা বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্পর্ককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং শেষ পর্যন্ত তা সংঘাতে রূপ নেয়। এসময়ে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর ভূমিকা নিয়ে অনেক সমালোচনা ও পর্যালোচনা রয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে ইন্ধনদাতা হিসেবে দায়ী করেছেন।[২] কিন্তু নওয়াব সলিমুল্লাহ সুবিধা বঞ্চিত পূর্ব বাংলার উন্নয়নের খাতিরেই সরকারের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনায় সমর্থন দিয়েছিলেন এবং তিনি এ অঞ্চলের নিপীড়িত মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন চেয়েছিলেন।[৩] পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হওয়ায় তিনি অনেকের কাছে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা পেয়েছেন। সত্যিই কি তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন? এই গবেষণায় আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। একজন মুসলিম হিসেবে নিজ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কামনা করা দোষণীয় নয়। নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও কেউ অসাম্প্রদায়িক হতে পারেন। নওয়াব

সলিমুল্লাহ সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পূর্ব বাংলার বিপুল সংখ্যক তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায়ও বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে তাঁর প্রতি ব্যাপক সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল।[৪] বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা প্রকাশিত হলে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা নিরসনে তিনি বিকল্প একটি প্রস্তাব নিয়ে বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় বসেন।[৫] স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনাকর মুহূর্তেও তিনি সাম্প্রদায়িক সংঘাত এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এ সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আহসান মঞ্জিলে ১৯০৭ সালের মে মাসে একটি সভা আহবান করেন। এই সভায় সাম্প্রদায়িক সংকট নিরসনে উভয় সম্প্রদায়ের ৪০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে শান্তি কমিটি গঠিত হয়।[৬] নওয়াব সলিমুল্লাহর বিরুদ্ধবাদী রাজনীতিবিদ ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ইসমাঈল হোসেন সিরাজী স্বদেশি আন্দোলনে সরকারের রোষানলে পড়লে নওয়াব তাঁর জন্য ছোট লাটের কাছে সুপারিশ করে তাঁর জামিনের ব্যবস্থা করেন।[৭] এতে নওয়াবের উদারনৈতিক মনোবৃত্তির পরিচয় ফুটে ওঠে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন জনদরদী ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের মানুষ ছিলেন।

নওয়াব পরিবার নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ড. হারুন অর রশীদ, ড. মো আলমগীর, অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন, ড. মুস্তাফিজ, অনুপম হায়াত প্রমুখ গবেষকগণ এ বিষয়ে প্রভূত কাজ করেছেন। তাঁদের লেখায় প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে নওয়াব পরিবারের সংশ্লিষ্টতার কথা উঠে এসেছে। ড. মো আলমগীর তাঁর 'মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস: ঢাকার নওয়াব পরিবারের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে নওয়াব পরিবারের ভূমিকা এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নওয়াবদের অর্থদান বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে এককভাবে তেমন কোন গবেষণা হয়নি। আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। বাংলা তথা ভারতের ভূরাজনৈতিক সংকটের পেছনে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বিশাল ভূমিকা রেখেছে।[৮] এ কারণে বাংলার আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণা করে সঠিক তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন জরুরি হয়ে পড়েছে। এতে ভবিষ্যত প্রজন্ম আন্তঃসাম্পদায়িক সম্পর্কের উন্নতি-অবনতির প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জেনে ভবিষ্যত কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারবে। উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের গতিধারায় বাংলার অন্যতম বৃহৎ জমিদার পরিবার হিসেবে ঢাকার নওয়াব পরিবারের ভূমিকা ছিল অনন্য। তাদের সেই ভূমিকা বিশ্লেষণপূর্বক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করা সময়ের দাবি হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতে বাংলার আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রশাসন ও বাংলার অন্যান্য জমিদারবর্গের ভূমিকা নিয়েও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা হতে পারে।

এই গবেষণা প্রবন্ধটি রচনায় সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত গুণগত (qualitative method) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকাশিত ইংরেজি ও বাংলা বই, প্রবন্ধ, সম্মেলন স্মারক, সমকালীন পত্রপত্রিকা, চিঠিপত্র, সরকারি রিপোর্ট ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় উৎস থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে বর্ণনামূলক গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিন্যাসকরণ গুণগত পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক। এ কারণে সংগৃহীত তথ্যসমূহ তিনটি পর্বে সন্নিবেশিত হয়েছে– সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ঢাকার নওয়াবগণের ভূমিকা, বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি নওয়াবগণের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসনে নওয়াবদের তৎপরতা।

বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়

ব্রিটিশ শাসনামলে অনুষ্ঠিত আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলায় বসবাসকারী সম্প্রদায়সমূহ ছিল– হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, আদিবাসী ও অন্যান্য।[৯] তবে হিন্দু ও মুসলিম এ দুটিই ছিল প্রধান সম্প্রদায়। ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতেও মুসলিমরা ছিল বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কিন্তু ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে তারা বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত হয়। ১৯১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় বাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫২ ভাগ মুসলিম এবং শতকরা ৪৫ ভাগ হিন্দু।[১০] ১৯২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলার জনসংখ্যার অনুপাত- মুসলিম ৫৩.৫৫%, হিন্দু ৪৩.৭২%, আদিবাসী ১.৭৯%, বৌদ্ধ ০.৫৮%, খ্রিস্টান ০.৩১%, অন্যান্য ০.০৫%।[১১] হিন্দুরা নানা বর্ণে ও গোত্রে বিভক্ত ছিল। তবে পূর্ব বাংলায় তফসিলি সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সংখ্যাই ছিল বেশি। মুসলিমদের মধ্যেও শিয়া, সুন্নী, ফরায়েজি, সাবেকী প্রভৃতি কিছু তাত্ত্বিক বিভাজন ছিল। ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের মধ্যে ইংরেজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেশ প্রভাব ছিল। জেমস ওয়াইজের বর্ণনায় বাংলায় বসবাসকারী স্থায়ী সম্প্রদায় হিসেবে আর্মেনীয় ও পর্তুগিজদের কথা জানা যায়।[১২] সংখ্যায় কম হলেও ঢাকা শহরে আর্মেনীয়রা বেশ প্রভাবশালী ও বিত্তবান ছিল। তবে উনিশ শতকের শেষার্ধে এসে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়া শুরু করে।[১৩] ঢাকার নওয়াবগণ তাদের জমিদারির প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, ব্যবসায়িক প্রয়োজন ও জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ঢাকার নওয়াব পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঢাকার নওয়াব পরিবারের আদি নিবাস ছিল কাশ্মীরে। তাঁদের পূর্বপুরুষরা আঠারো শতকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে কাশ্মীর থেকে দিল্লিতে এবং দিল্লি থেকে বাংলায় আগমন করেন।[১৪] এই পরিবার পূর্বে 'খাজা পরিবার' নামে পরিচিত ছিল।[১৫] বাংলায় খাজা পরিবারের একটি অংশ ঢাকায় এবং একটি অংশ সিলেটে বসতি স্থাপন করে। তবে সিলেটে বসবাসকারীরা পরবর্তীতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।[১৬] তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ সম্পদ অর্জন করেন এবং উনিশ শতকের প্রথমদিকে তারা এসব সম্পদ ব্যয় করে অনেক ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।[১৭] খাজা আলীমুল্লাহ ঢাকায় খাজা পরিবারকে সুসংগঠিত করেন। তিনি খাজা পরিবারের সকল সম্পত্তিকে একটি ট্রাস্টের আওতায় নিয়ে আসেন এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র খাজা আবদুল গণিকে এর মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে ১৮৪৪ সালে একটি ওয়াকফনামা সম্পাদন করেন।[১৮] এই ওয়াক্ফ নামাটিই ছিল খাজা পরিবারের যাবতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। বিভিন্ন সময়ে ঢাকার পুরোনো ও পতনোন্মুখ জমিদারিগুলোর সম্পত্তি কিনে নিয়েছিল এই খাজা পরিবার। ১৮৩০ সালে খাজা আলীমুল্লাহ ঢাকার ইসলামপুরে ফরাসীদের একটি বাণিজ্য কুঠি কিনে সংস্কারপূর্বক বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৮৫৯ সালে খাজা আবদুল গনি সেখানে 'আহসান মঞ্জিল' নামে প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরি করেন যা 'ঢাকার নওয়াব বাড়ি' নামে খ্যাতি লাভ করে।[১৯]

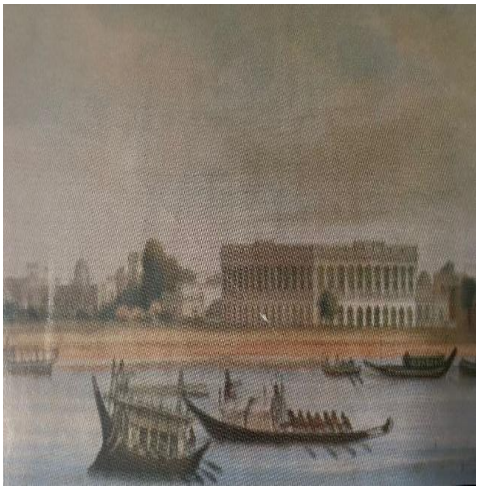

চিত্র-১: খাজা আলীমুল্লাহর বাড়ি ১৮৩০

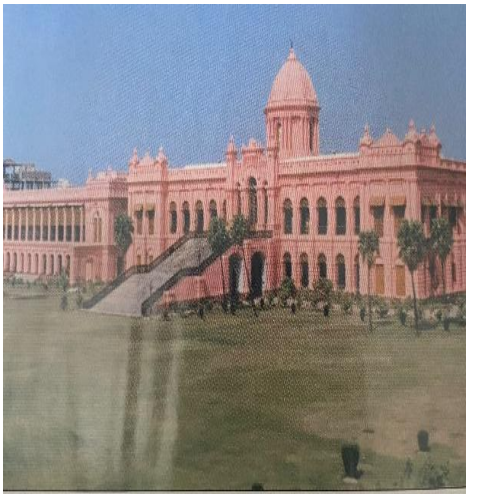

চিত্র-২ : আহসান মঞ্জিল ১৯৯২

খাজা আবদুল গণি তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে খাজা পরিবারের জমিদারিকে পূর্ব বাংলার সর্ববৃহৎ জমিদারিতে পরিণত করেন।[২০] ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় খাজা আবদুল গণি ইংরেজদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং তাঁর সহায়তায় ইংরেজরা ঢাকার বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন।[২১] এ কারণে ইতিহাসে তিনি সমালোচিত হয়েছেন। শুধু তিনিই নন বাংলার আরও অনেক জমিদার সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করেছিল।[২২] ইংরেজদের প্রতি খাজা আবদুল গণির আনুগত্য ও সমর্থন তাঁকে ইংরেজদের প্রিয়পাত্রে পরিণত করে। তিনি ১৮৬১ সালে ঢাকার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৮৬৬ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৮৭১ সালে 'সি এস আই' এবং ১৮৭৫ সালে 'নওয়াব' উপাধি লাভ করেন।[২৩] ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি রানী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি বরণ উপলক্ষে দিল্লীরদরবারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে খাজা আবদুল গনির 'নওয়াব' খেতাবটিকে বংশগত করা হয়।[২৪] পরিবার প্রধানের অবর্তমানে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই খেতাব প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৬ সালে নওয়াব খাজা আবদুল গনির মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ ঢাকা নওয়াব এস্টেটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২৫]



চিত্র-৩ : নওয়াব আব্দুল গণি



চিত্র-৪ : নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ

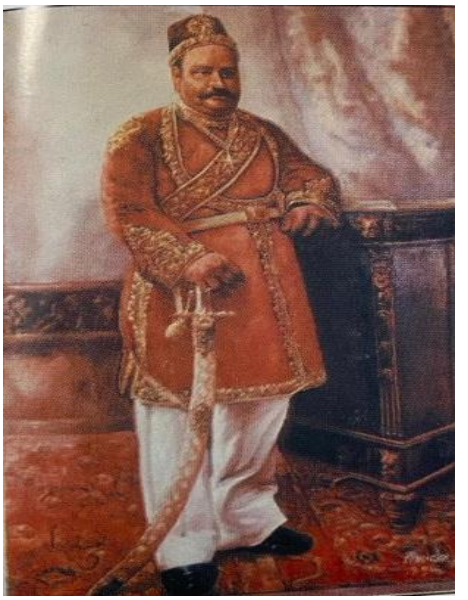

চিত্র-৫ : নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ

১৯০১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ নওয়াব এস্টেটের প্রধান হন।[২৬]

১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ নওয়াব এস্টেটের দায়িত্ব নেন।[২৭] নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত 'নওয়াব' উপাধিধারী ঢাকার শেষ নওয়াব। ১৯৫২ সালের ১৪ এপ্রিল পাকিস্তান সরকার জমিদারি উচ্ছেদ আইনের আওতায় ঢাকা নওয়াব এস্টেট অধিগ্রহণ করে এবং ১৯৫৮ সালের ২১ নভেম্বর নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঢাকার নওয়াব পদটিরও অবসান হয়।[২৮] তবে নওয়াব পরিবারের পরবর্তী উত্তরসূরিগণও বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন, খাজা শাহাবুদ্দিন, খাজা খায়রুদ্দিন প্রমুখ।[২৯]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ঢাকার নওয়াবগণের ভূমিকা:



চিত্র: ৬ নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অঙ্গনে প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপী ঢাকার নওয়াব পরিবার প্রবল প্রতাপের সাথে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে ঢাকার নওয়াবগণ পূর্ব বাংলার আপামর মানুষের অঘোষিত অভিভাবকের স্থান অধিকার করেছিলেন। অত্র অঞ্চলের সকল সম্প্রদায়ের সাথেই নওয়াব পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

লাগিয়ে ঢাকার নওয়াবগণ বাংলার আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতিকে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরেজ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণও নওয়াবগণের এই ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৩০]

ভারতের অন্যান্য ভূস্বামীদের ন্যায় ঢাকার নওয়াবগণ ইংরেজ সরকার ও তাদের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন।[৩১] খাজা আলীমুল্লাহ, নওয়াব খাজা আবদুল গণি ও নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ উচ্চ পদস্থ ইংরেজদের জন্য বলনাচ ও ঘোড়দৌড়সহ নানা আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করতেন।[৩২] উপহার প্রদানের মাধ্যমে রাজপুরুষ ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জন তৎকালীন সম্পদশালী ব্যক্তিদের রীতি ছিল। ঢাকার নওয়াবগণও এই রীতি অনুসরণ করে সরকারের সুদৃষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন। ওয়েলসের যুবরাজ কলকাতা সফরে আসলে নওয়াব খাজা আবদুল গণি ঢাকার ইতিহাসখ্যাত মসলিনবস্ত্রসহ বহু মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিয়েছিলেন।[৩৩] ঢাকার কমিশনার মি. সিরেজ সাহেবের মেয়ের বিয়েতে নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ তৎকালীন প্রায় দশ হাজার টাকা মূল্যের উপহার সামগ্রী দিয়েছিলেন।[৩৪] ১৮৭১ সালে ওয়েলসের যুবরাজের টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনে নওয়াব খাজা আবদুল গণি জনকল্যাণে পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৩৫] পরবর্তীতে তিনি এই ফান্ডে আরও দুই লাখ টাকা অনুদান দিয়ে ঢাকাবাসীর জন্য প্রথম বিশুদ্ধ পানির কলের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩৬] সরকারি বিভিন্ন ফান্ডে নওয়াব পরিবারের দানের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এভাবে ইংরেজ রাজন্যবর্গের সাথে ঢাকার নওয়াব পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মনে করেন যে নওয়াব আবদুল গনির মত ব্রিটিশের উপর অত প্রভাব বাংলার অন্য কোন জমিদারের ছিল না।[৩৭] ঢাকার নওয়াবগণ ব্রিটিশ সরকারের উপর তাদের এই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে পূর্ব বাংলার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।[৩৮]

প্রাক ব্রিটিশ আমলে এদেশের ঝগড়া বিবাদ মীমাংসার ভার স্থানীয় পঞ্চায়েত এর হাতে ন্যস্ত ছিল। ব্রিটিশ প্রশাসন পঞ্চায়েতের এই ক্ষমতা বিলুপ্ত করেছিল। নওয়াব খাজা আবদুল গনির প্রচেষ্টায় ঢাকায় এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৮ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এন হেয়ার ছোট ছোট মামলার বিচার পঞ্চায়েতের উপর ছেড়ে দেন।[৩৯]



চিত্র-৭ : ঢাকার পঞ্চায়েত সভা ১৯০৬

স্থানীয় জনগণ প্রত্যেক মহল্লায় একজন করে পঞ্চায়েত সর্দার ও একজন নায়েবে সর্দার নির্বাচিত করতেন। ঐ সর্দারকে ঢাকার নওয়াবগণ পাগড়ি পরিয়ে স্বীকৃতি দিতেন। আহসান মঞ্জিল ছিল মহল্লাসমূহের কলহ বিবাদের সর্বোচ্চ বিচারালয়। নওয়াবদের বিচারের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকার সর্বশ্রেণির মানুষ আহসান মঞ্জিলে বিচার প্রার্থী হতেন। নওয়াবগণের দরবারের দেয়া রায় সরকারি আদালতের রায়ের সমান মর্যাদা পেত। ঢাকার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এবং বিশেষ করে মুসলিম সমাজ নওয়াব আবদুল গণিকে তাদের অভিভাবক মনে করতেন। এ কারণে সকলেই নওয়াবের পুনর্গঠিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিল।[৪০] ঢাকার সরকারি প্রশাসনও অনেক সময় গুরুতর সমস্যা সমাধানে নওয়াবের স্মরণাপন্ন হত।[৪১] ১৮৬৯ সালে ঢাকা শহরে মারাত্মক শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সরকার তা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে নওয়াব খাজা আবদুল গনির স্মরণাপন্ন হয়। নওয়াব বাহাদুর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে শালিশীর মাধ্যমে এই সমস্যার মীমাংসা করেন। এই মীমাংসা করতে গিয়ে তাকে বিশ হাজার মানুষকে আহসান মঞ্জিলে চার দিন ধরে নিজ খরচে আপ্যায়ন করতে হয়েছিল।[৪২] নিজেরা সুন্নি মতের অনুসারী হলেও শিয়া সম্প্রদায়ের সাথে নওয়াব পরিবারের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। ১৮৪৩ সালে শেষ মুঘল নায়েবে নাজিম গাজিউদ্দিন হায়দারের মৃত্যুর পর ঢাকার হোসেনি দালানের মোতওয়াল্লির পদ শূন্য হয়ে যায়। এ অবস্থায় খাজা আলীমুল্লাহ উক্ত ইমামবাড়া রক্ষণাবেক্ষণ ও মহররম উৎসবের ব্যয় বহনে এগিয়ে আসেন।[৪৩] এই প্রেক্ষাপটে সরকার খাজা আলীমুল্লাহকেই ইমামবাড়ার মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে এবং ঢাকার শিয়াগণ তা সানন্দে মেনে নেয়। খাজা আহসানুল্লাহ ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হোসেনি দালান পুনর্নির্মাণ করেন।[৪৪] এভাবে নওয়াব পরিবার শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করতেন। ১৮৮৬ সালে মহররমের মিছিলে ইংরেজ পুলিশের একটি গাড়ি ঢুকে পড়লে পুলিশ ও মিছিলকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। নওয়াব আবদুল গনির হস্তক্ষেপে এই সংঘর্ষের অবসান হয়।[৪৫] ১৯০৮ সালেও মহররমের মিছিলকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে এবং শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নওয়াব সলিমুল্লাহ সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পুলিশদের বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।[৪৬]

পূর্ববঙ্গের বেশিরভাগ জমিদার ছিলেন বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের। এই জমিদারবর্গ মিলে 'পূর্ববঙ্গ জমিদার সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। নওয়াব খাজা আবদুল গনি ছিলেন এই সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি। জমিদার সমিতিতে ঢাকার নওয়াব পরিবারের নেতৃত্বের ধারা নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ পর্যন্ত বজায় ছিল। নওয়াবগণ জমিদার সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে একদিকে সরকারের নিকট সম্মিলিতভাবে তাদের দাবিদাওয়া পেশ করতেন, অন্যদিকে সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে সকলকে সম্পৃক্ত করে সৌহার্দের পরিবেশ নিশ্চিত করেছিলেন। ১৯১৩ সালে সরকার বরিশাল জেলায় পথকর বৃদ্ধি করলে স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম যৌথভাবে আন্দোলন করেছিল। নওয়াব সলিমুল্লাহ বরিশালের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে ঢাকার কমিশনারের কাছে একটি ডেপুটেশন পেশ করেন।[৪৭] এই ডেপুটেশনের চেষ্টায় কমিশনার সাহেব সরকারের লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি সত্ত্বেও উক্ত কর বাতিল করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দূর্গত মানুষের সেবা করার জন্য নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ 'নওয়াব আবদুল গনি রিলিফ ফান্ড' নামে একটি ফান্ড গঠন করেছিলেন। এই ফান্ড পরিচালনার জন্য ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। এই ট্রাস্টি বোর্ডের ৬ জন সদস্য ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী।[৪৮] সরকার ঢাকার নওয়াব পরিবারের জমিদারি উচ্ছেদের আগ পর্যন্ত এই ফান্ডের কার্যক্রম চালু ছিল। প্রথমে

এই ফান্ডের সেক্রেটারি ছিলেন সৈয়দ আওলাদ হোসেন, পরে বাবু ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায় সেক্রেটারি হন।[৪৯]

এদেশের তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুগণ, যারা এদশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা ঢাকার নওয়াবগণকে নিজেদের অভিভাবক মনে করতেন। তারা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়ে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর পক্ষাবলম্বন করে বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে বাংলার নমশূদ্রগণ ১৯০৬ সালে ওরাকান্দিতে একটি সম্মেলন করে ঘোষণা করেছিলেন যে উচ্চ বর্গের হিন্দুদের ঘৃণা ও লাঞ্ছনার প্রেক্ষিতে তারা তাদের মুসলিম ভাইদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে।[৫০] নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সুখ দঃখের ভাগীদার হতেন। ঢাকার কৃতি সন্তান উকিল শ্রী লালমোহন দাস কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হলে নওয়াব সলিমুল্লাহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ঢাকার নর্থব্রুক হলে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেন।[৫১] সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগরের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে নওয়াবের সভাপতিত্বে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[৫২]

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়াও বাংলার অন্যন্য প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সাথেও ঢাকার নওয়াবগণ উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। নওয়াব এস্টেট পরিচালনায় হিন্দু কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরই প্রাধান্য ছিল। তবে নওয়াবগণ উচ্চ পদে অল্প কিছু সংখ্যক ইংরেজও নিযুক্ত করেছিলেন। এতে অনেক সময় হিন্দু কর্মকর্তাগণ অসন্তুষ্ট হতেন এবং তারা বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ কর্মকর্তাদের সমালোচনা করে ঢাকা প্রকাশ পত্রিকা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল।[৫৩] কিন্তু নওয়াবগণ এসবে কর্ণপাত না করে বলিষ্ঠতার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করতেন। ব্যবসায়িক সম্পর্কের সুবাদে ঢাকার প্রভাবশালী আর্মেনিয়ান বণিক গোষ্ঠীর সাথেও নওয়াব পরিবারের সুসম্পর্ক বজায় ছিল।[৫৪]

এছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও ঢাকার নওয়াবগণ অসাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। ১৮৯৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষে 'সমাজ সম্মিলনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৫] নওয়াব আহসানুল্লাহ এই মহতী উদ্যোগে শামিল হয়ে সমিতিতে ৩০০ টাকা দান করেন এবং ভবিষ্যতে ঐ সভার অভিভাবক হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।[৫৬] ১৮৮২ সালে ৮ ফেব্রুয়ারি নর্থব্রুক হলে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়। এই পাঠাগার স্থাপনকালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ও বইপত্র দান করে খাজা আবদুল গনি ও ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৫৭]

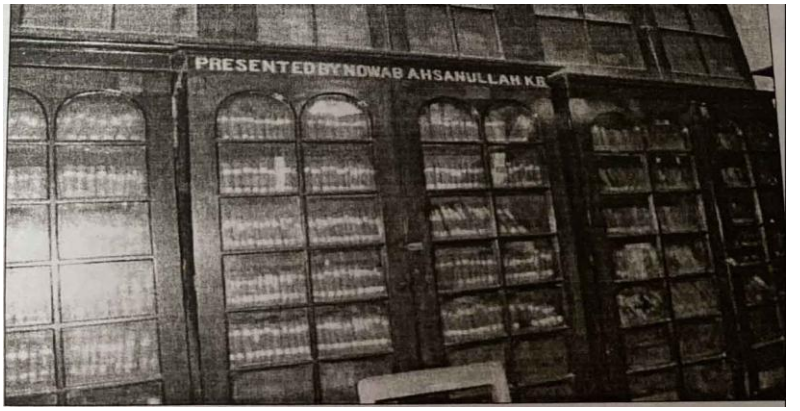

চিত্রঃ ৮ জনসন হল পাঠাগারে নওয়াব আহাসন উল্লাহর দানকৃত বইসমূহ

উক্ত লাইব্রেরিতে খাজা আবদুল গনি একাই ৭০০ বই দান করেছিলেন।[৫৮] অবিনাশচন্দ্র মজুমদার ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ' গঠিত হলে পূর্ব বাংলার চারজন জমিদার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে নওয়াব সলিমুল্লাহ ছিলেন অন্যতম।[৫৯]

ঢাকার নওয়াবদের জমিদারি কার্যক্রম এদেশের আপামর মানুষের ভাষা বাংলাতেই পরিচালিত হত। ঢাকার ব্রাহ্ম হিন্দুদের উদ্যোগে প্রকাশিত 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নওয়াব আবদুল গনি। তিনি তার কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত এই পত্রিকার কপি ক্রয় করতেন। এজন্য পত্রিকার একটি সংখ্যায় নওয়াবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।[৬০] ১৮৮৫ সালে একজন ইটালিয়ান পণ্ডিত এদেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা সম্পর্কে জানার জন্য ঢাকায় আসেন। এ উপলক্ষে নওয়াব আবদুল গনি দিলখুশার বাগানবাড়িতে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা ও বিক্রমপুরের খ্যাতনামা সংস্কৃত পণ্ডিত, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন।[৬১] বাংলা সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক দীনেশ চন্দ্র সেন অসুস্থতার কারণে অর্থ সঙ্কটে পড়েন। ১৯০২ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত দীনেশচন্দ্রের জন্য সাহায্য চেয়ে নওয়াব সলিমুল্লাহর কাছে পত্র লিখে অনুরোধ করেন এবং নওয়াব তাঁকে বেশ কিছু অর্থ দান করেন।[৬২] ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলে নওয়াব সলিমুল্লাহ কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি তারবার্তা পাঠান।[৬৩]

ঢাকার নওয়াবগণ সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের উৎসাহ দিতেই যথাসাধ্য পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। ঈদ, মহররম ও জন্মাষ্টমী ছিল ঢাকার তিনটি প্রধান উৎসব। নওয়াবদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবাদি বাড়তি জৌলুস পেয়েছিল। পূর্ব বাংলার হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের দৌরাত্ম্যে মুসলিমরা নির্বিঘ্নে গরু কুরবানি করতে পারত না এবং কুরবানি ঈদ বকরা ঈদে পরিণত হয়েছিল।[৬৪] ধর্মীয় অধিকার নির্বিঘ্নে পালন করতে না পারায় মুসলিমদের অন্তরে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করত যা মাঝে ঝেই সাম্প্রদায়িক সংঘাতের উপলক্ষ্য তৈরি করত। নওয়াবদের সহায়তায় ঈদুল আজহায় সমারোহের সাথেই গরু কুরবানি করা হত। নওয়াব সলিমুল্লাহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে পত্রাদি প্রেরণ করে এ বিষয়ে অবহিত করেছিলেন এবং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কলকাতার বেলুড় মঠে গিয়ে বিখ্যাত ধর্মগুরু শরৎ মহারাজের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।[৬৫] ১৮৭৪ সালে নওয়াব খাজা আবদুল গনি ও খাজা আহসানুল্লাহ আরমেনিয়ান চার্চে ক্রিসমাস উৎসবে সৌজন্য সাক্ষাতে গিয়েছিলেন।[৬৬] এই দুজন নওয়াব হিন্দুদের জন্মাষ্টমী, হোলিগান ও বসন্ত উৎসবেও যোগ দিতেন। ঢাকার নওয়াবগণ বরাবরই জন্মাষ্টমীর মিছিলে পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন।[৬৭]



চিত্র: ৯ ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি নওয়াবগণের পৃষ্ঠপোষকতা

ঢাকার নওয়াবগণ তাদের দানশীলতা ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের দানশীলতার খ্যাতি বাংলা পেরিয়ে বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁরা যে সংকীর্ণ গোত্রীয় মনোবৃত্তির উর্ধ্বে উঠে আপামর মানুষের জন্য কাজ করেছিলেন,তা তাঁদের বিপুল দানের তালিকা থেকে তা সহজেই অনুমেয়।[৬৮] ১৮৯৮ সালে ভারতে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিলে নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ তৎকালীন প্লেগ মহামারী মোকাবেলার জন্য লক্ষ্যাধিক টাকা ব্যয় করে 'নওয়াব আবদুল গনি প্লেগ ফান্ড' নামে একটি ফান্ড গঠন করেছিলেন।[৬৯] নওয়াবের অনুরোধে ইংরেজ সরকার আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং এ কারণে প্লেগ ঢাকায় মহামারী আকারে ছড়াতে পারেনি। ১৮২২ সালে নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ এই ফান্ডের উদ্বৃত্ত অর্থ কেবল পশ্চাদপদ মুসলিমদের শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করার একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু মূল দলিলে এই ফান্ডের অর্থ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য বরাদ্দ থাকায় নওয়াবের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি।[৭০] নওয়াব খাজা আবদুল গনি ঢাকা শহরের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে গরীব পরিবারের সন্তানদের জন্য আহসান মঞ্জিলের কাছে কুমারটুলিতে নিজস্ব একটি ভবনে অবৈতনিক বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৭১] ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ ৩৩ বছর এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাবু মোহন চাঁদ বসাক এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেশির ভাগই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের।[৭২] নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা দানের ধারা জারী রেখেছিলেন। ঢাকার জ্যোতিশচন্দ্র দাশগুপ্তের মতে, নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দানের কথা বলে শেষ করা যাবে না।[৭৩] নওয়াব পরিবারের এই ঐতিহ্য পালনে নওয়াব সলিমুল্লাহও পিছিয়ে ছিলেন না। তিনি ১৯০২ সালে ঢাকার নববিধান সম্প্রদায়ের সমাজ গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগের যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন[৭৪] এবং ১৯১০ সালে ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র তৈরি করে দিয়েছিলেন[৭৫]।

ঢাকার নওয়াবগণ হিন্দু প্রধান কলকাতা শহরের উন্নয়নে ও জনকল্যাণে উদার হস্তে ব্যয় করেছিলেন। নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ ১৮৬৬ সালে কলকাতা দুর্ভিক্ষ তহবিলে ১০০০/- টাকা, ১৮৮২ সালে কলকাতায় দুটো পানির ফোয়ারা নির্মাণে ১০০০/- টাকা, ১৮৮৯ সালে কলকাতা কুষ্ঠ রোগীদের আশ্রমে ৫০০০/- টাকা এবং কলকাতা হিন্দু হোস্টেল নির্মাণে ৪০০০/- টাকা দান করেছিলেন।[৭৬] নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ১৯০৫ সালে রাঁচি কলেজ ফান্ডে ৪০,০০০/- টাকা দান করেছিলেন।[৭৭]

নওয়াব পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণও তাদের অনুগ্রহ বিতরণে জাতিভেদ বিচার করতেন না। নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর বিধবা স্ত্রী খোদেজা বেগম ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অবস্থানকালে কলকাতার অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বিদ্যালয় তহবিলে ১০০ টাকা দান করেছিলেন।[৭৮] ঢাকার এক অনাথ আশ্রমের হিন্দু যুবতীর বিয়ে অর্থের অভাবে আটকে গেলে আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকার ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য চেয়ে নিরাশ হন। খোদেজা বেগম ঐ বিয়ের সকল ব্যয়ভার বহন করেন।[৭৯] নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহর কন্যা পরীবানু ১৯১৩ সালে তাঁর গৃহচিকিৎসক রায় যোগেশচন্দ্র ঘোষের মাধ্যমে তাঁর সন্তানদের মূল্যবান জামা-কাপড় অনাথ আশ্রমের বাচ্চাদের দান করেন।[৮০] নওয়াব খাজা

আহসানুল্লাহর আরেক কন্যা আমিনা বানু ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকার স্কুলসমূহের সকল ছাত্রছাত্রীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৮১] ১৯১৮ সালে নওয়াবজাদী আক্তার বানু তাঁর পিতার স্মরণে ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশনের ভোজনালয় পাকা করে দেন। ভোজনালয়ের গায়ে স্থাপিত শিলালিপিটি এখনও বিদ্যমান (চিত্র: ১০)।[৮২]

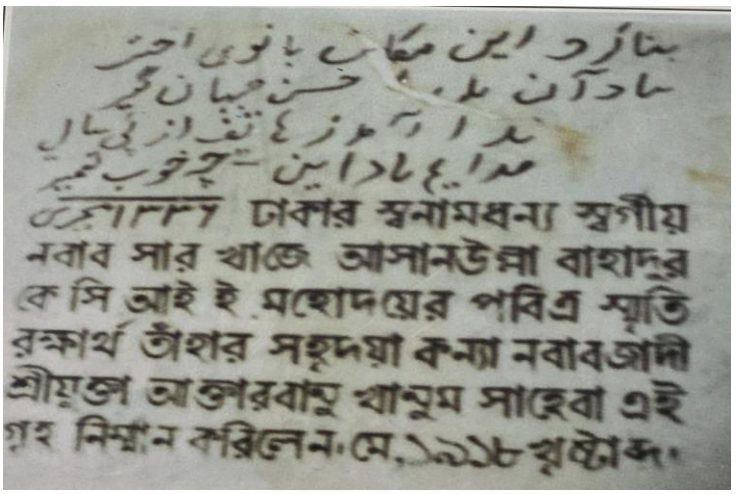

চিত্র ১০ : রামকৃষ্ণ মিশনের ভোজানালয়ের গায়ে স্থাপিত শিলালিপি

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এর প্রথম উপাচার্য মিঃ হার্টগকে নওয়াব পরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল এবং এই অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন নওয়াবজাদী মেহেরবানু।[৮৩]

পূর্ববাংলায় দাঙ্গা নিরসনে ঢাকার নওয়াবগণের তৎপরতা

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম একশত বছরে ব্রিটিশবিরোধী নানা বিদ্রোহ ও সংগ্রাম সংঘটিত হলেও ভারতীয়দের মধ্যে বড় আকারে আন্তঃসাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব সংঘাতের তেমন কোন খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রিটিশদের ভাগ কর ও শাসন কর নীতি এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মোড়কে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদের উন্মেষ এবং এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ভারতের আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতিতে ভিন্নমাত্রা যোগ করে। বিশ শতকের শুরু থেকেই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সংঘাতে রূপ নিতে থাকে। ১৯০৪ সালে ঢাকার নওয়াবপুরে মসজিদের সামনে দিয়ে নামাজ চলাকালে শাঁখারী বাজারের হিন্দু পূজারীদের বাদ্য বাজিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ঢাকায় প্রথম একটি দাঙ্গা হয়। ঢাকার ম্যজিস্ট্রেট মিঃ র‍্যাংকিনকে সাথে নিয়ে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ এর মীমাংসা করেন এবং ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির জনপ্রিয় প্রশাসক, নওয়াব পরিবারের খাজা ইউসুফজান মুসলমানদের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করেন।[৮৪] ভবিষ্যতে এ ধরণের সংঘাত এড়াতে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর আহবানে ১৯০৬ সালে পূর্ব বাংলার লেঃ গভর্নর নামাজের সময় মসজিদের সামনে বাদ্য বাজানো বন্ধ রাখা সংক্রান্ত একটি আইন পাশ করেন।[৮৫]

১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রপাত এবং ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের গতিপথকে আরও জটিল করে। এ সময়

সাম্প্রদায়িক উষ্কানি দিয়ে নামে বেনামে নানা প্রচারপত্র ও গুজব ছড়িয়ে পড়ে।[৮৬] এসবের পেছনে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর ইন্ধনের অভিযোগ ওঠে এবং কিছু অসৎ ব্যক্তিবর্গ ভণ্ড ফকির, মোল্লা সেজে নওয়াবের নাম ভাঙিয়ে নানা অপকর্ম শুরু করে। ১৯০৭ সালে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ একটি ইশতেহার প্রকাশ করে এসব মিথ্যা প্রচারণার নিন্দা করেন এবং দোষীদের খুঁজে বের করে আইনে সোপর্দ করার আহবান জানান।[৮৭] স্বদেশী আন্দোলন চলাকালীন নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ কুমিল্লা সফরে গেলে স্বদেশিপন্থি হিন্দুগণ বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ হয়।[৮৮] বিক্ষুব্ধ মসলিমগণ ঢাকার শাহবাগে প্রতিবাদ সভায় মিলিত হলে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ সবাইকে সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের অনুরোধ করেন এবং শিক্ষাদীক্ষা ও ব্যবসা বাণিজ্যে পারদর্শিতা অর্জনের মাধ্যমে হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্যের জবাব দেয়ার আহবান জানান।[৮৯] পাশাপাশি সঙ্কটকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯০৭ সালের মে মাসে নওয়াব হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে আহসান মঞ্জিলে একটি সভায় মিলিত হন। সভায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উভয় সম্প্রদায়ের ৪০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৯০] ১৯১১ সালে কোন পূর্বালোচনা ছাড়াই হঠাৎ করে বঙ্গ বিভাগ রদের ঘোষণা পূর্ব বাংলার মুসলিমদের বিক্ষুব্ধ করে। এ অবস্থায় নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখার জন্যে ১৯১২ সালের ১৯ মে হিন্দু-মুসলিম গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেন।[৯১] নওয়াবের এসব দূরদর্শী ও তাৎক্ষণিক উদ্যোগের কারণে দীর্ঘ দিন ঢাকা দাঙ্গা মুক্ত থাকে।[৯২]

১৯২৬ সালে কলকাতায় ভীষণ দাঙ্গা শুরু হলে ঢাকায় এর প্রভাব মোকাবেলায় নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আহসান মঞ্জিলে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করেন। এই সভায় হিন্দু নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, রায় বাহাদুর প্যারীলাল দাস, ডাঃ মোহনী মোহন দাস ও বাবু ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।[৯৩] কিন্তু পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় নি। পুরো বছর জুড়ে নানা উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত বাধে। ইতিপূর্বে মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাদ্য বন্ধ রাখা সংক্রান্ত আইনটি নিয়ে হিন্দু মহাসভা অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং একে সর্বভারতীয় ইস্যু হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। ১৯২৬ সালের ২৯ এপ্রিল ঢাকার আমলীগোলা মসজিদের সামনে এশার নামায চলাকালীন বাদ্য বাজানোকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধে। নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ দ্রুত হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে উত্তেজনা প্রশমনে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।[৯৪] একই বছর ১১ জুলাই ঢাকার আরমানিটোলার খেলার মাঠে এক মুসলিম বালককে হিন্দু ছাত্ররা প্রহার করলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট ও কিছু পুলিশসহ দ্রুত সেখানে হাজির হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।[৯৫]

১৯২৬ সালে সারা ভারতব্যাপী আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। পূর্ববাংলায়ও এর প্রভাব পড়ে। এ বছর ঢাকার মুসলিমগণ মসজিদের সামনে দিয়ে চিরাচরিত জন্মাষ্টমীর মিছিলে বাদ্য বাজনোর প্রতিবাদ জানায়। এ অবস্থায় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ফিলপট হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি শালিসী বৈঠকে বসেন। এ বৈঠকে দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ মুসলিমদের আপত্তি উপেক্ষা করে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য অনুযায়ী জন্মাষ্টমীর মিছিলে বাদ্য বাজানোর পক্ষে মত দেন।[৯৬] কিন্তু জন্মাষ্টমী মিছিলে অতি উৎসাহী

হিন্দুরা এ বছর 'হিন্দু ধর্মের জয়' 'বন্দে মাতরম' প্রভৃতি ধ্বনি যোগ করে স্লোগান দেয়ার রীতি চালু করে। মিছিলকারীরা বিভিন্ন মসজিদের সামনে সমবেত হয়ে উচ্চস্বরে স্লোগান দেয় এবং এর ফলে মালিটোলা ও নারিন্দা মসজিদের সামনে মুসল্লিদের সাথে গোলযোগ বাধে।[৯৭] নওয়াব হাবিবুল্লাহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বাদামতলী মসজিদে গুলি বর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি এতটাই উতপ্ত হয়ে ওঠে যে নওয়াবের পক্ষে তা সামাল দেয়া সম্ভব হয়নি এবং হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় জানমালের বেশ ক্ষতি হয়।[৯৮] এ ঘটনার পর প্রায় চার বছর ঢাকার পরিস্থিতি শান্ত থাকে।

১৯৩০ সালের দিকে আবার গোলযোগ শুরু হয়। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি মিছিল নারিন্দা মসজিদের সামনে এসে গোলযোগ বাধায় এবং কিছু দুর্বৃত্ত মসজিদে ঢুকে কুরআন অবমাননা করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় বড় আকারে দাঙ্গা হয়।[৯৯] এ অবস্থায় নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করে দাঙ্গা নিরসনের চেষ্ট করেন।[১০০] কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিই ছিল ভয়ানক রকম উত্তেজনাপূর্ণ। ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা বেধে যেত। একই বছর মে মাসে শাঁখারী বাজারের একটি দূর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধে।[১০১] এসময় নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। দাঙ্গার খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ঢাকায় ফিরে আসেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন।[১০২] এ বছরই ২২ মে হিন্দু-মুসলিম দুই বালকের লাটিম খেলা নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে উভয় সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ হয়। নওয়াব সাহেব ৫ জন হিন্দু ও ৫ জন মুসলিম সহকারে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কায় ২৪ মে ঢাকার কালেক্টর সাহেবকে সেনাবাহিনী মোতায়েনের অনুরোধ জানান।[১০৩] দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন রাতেই ফকিরাপুলে একজন মুসলিম যুবক কিছু হিন্দু দুর্বৃত্ত কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হয় এবং নিহত ব্যক্তির শবযাত্রায় হিন্দুরা আক্রমণ করলে সারা শহরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গা দমনে সরকার পুলিশ ও সেনা সদস্য নিয়োগ করেন এবং নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ স্বয়ং হিন্দু পল্লীতে ঘুরে ঘুরে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করেন।[১০৪] ড. মো: আলমগীর মনে করেন যে ঢাকার নওয়াবদের সময়োচিত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ঢাকায় দাঙ্গার প্রকোপ ও ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছিল।[১০৫] ১৯৩০ সালের দাঙ্গা নিয়ে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে অমৃতবাজার পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল- "The leading Mohamadans of Dacca tried thier level best to establish peace and amity between the two parties by compromising all criminal cases."[১০৬] ১৯২৬ থেকে ৩০ সালে ঢাকার দাঙ্গা মোকাবেলায় নওয়াব পরিবারের ভূমিকা উল্লেখ করে দাঙ্গা সংক্রান্ত একটি সরকারি রিপোর্টে বলা হয়- "The strongest supporter of Government in the attempt to preserve law and order and to keep the two communities at peace was the Nawab of Dacca, keenly seconded by the other members of the Nawab family"[১০৭]

মূল্যায়ন

ঢাকার নওয়াবগণ বাংলার সকল সম্প্রদায়কে সৌহার্দের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁরা সামাজিক কর্মকাণ্ড ও উৎসবাদিতে আপামর সকল মানুষকে সম্পৃক্ত করে সম্প্রীতির অনন্য নজীর সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্ম বর্ণের ভেদাভেদ না করে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য আহসান মঞ্জিলের দ্বার ছিল উন্মুক্ত। তাঁরা জনকল্যাণের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা তৎকালীন

অন্যান্য ভূস্বামীগণের মধ্যে বিরল ছিল। ঢাকার নওয়াবগণ যে কোন সম্প্রদায়ের গুণী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা দানে কার্পণ্য করতেন না এবং গুণী ব্যক্তিদের সংবর্ধনার আয়োজনে সকল সম্প্রদায়কে একত্রিত করতেন। তাঁরা সাংস্কৃতিক ও চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে সকলকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক উৎকর্ষের পথকে উন্মুক্ত করেছিলেন। এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের যে ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল তা আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল।

ঢাকার নওয়াবগণের জনকল্যাণমূলক কাজের পরিধি ছিল বিস্তৃত। আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত দানের দীর্ঘ তালিকা এর সাক্ষর বহন করছে। তাঁরা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে উঠে সকল সম্প্রদায়ের পীড়িত মানুষের প্রতি তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। শুধু অসহায় ব্যক্তিবর্গ নয়, অন্য সম্প্রদায়ের দাতব্য প্রতিষ্ঠান এমন কি ধর্মীয় উপাসনালয় সংস্কারেও নওয়াবগণ অর্থ ব্যয় করেছেন। নওয়াবগণ যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগে ধর্ম বর্ণ সকল মানুষের ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। প্লেগ মহামারী থেকে ঢাকাবাসীকে রক্ষার জন্য নওয়াব খাজা আবদুল গনি কর্তৃক প্লেগ ফান্ড গঠন এবং ফান্ডকে সকল সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত রাখার নীতি গ্রহণ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু বাংলা নয়, বাংলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলসহ বহির্বিশ্বেও বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময়ে নওয়াবগণের দানের ইতিহাস রয়েছে।আদিবাসী সম্প্রদায়ও তাঁদের সাহায্যের বাইরে ছিল না।[১০৮] নওয়াবগণের এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আন্তঃসাম্প্রদায়িক সংকট নিরসনেও ঢাকার নওয়াবগণ অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। যে কোন সংকটে তাঁরা তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নিতেন এবং বিবদমান সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একত্রিত করে শালিসীর মাধ্যমে মীমাংসা করতেন। ফলে ঢাকায় তথা পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি তুলনামূলকভাবে কম ছিল। বঙ্গভঙ্গকালীন সংঘাতকে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ দূরদর্শিতার সাথে মোকাবেলা করেছিলেন বলে তা মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। স্বদেশি আন্দোলনের ফলে বাংলায় আন্তঃসাম্প্রদায়িক যে সংকট তৈরি হয়েছিল তা নিরসন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছিলেন। পশ্চাৎপদ মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নে তাদেরকে সংগঠিত করার জন্য তিনি যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেকারণে তাঁকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়া যায় না। ত্রিশের দশকে সারা বাংলাব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসমূহের সময়ে নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহও প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু এককভাবে তৎকালীন ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, তাঁর সাধ্যের অতীত ছিল। দেশভাগের পূর্ব মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সর্বভারতীয় সমস্যায় রূপ নিয়েছিল যা একক কোন ব্যক্তির পক্ষে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিল না। দেশভাগকালীন সাম্প্রদায়িক সংঘাত যে বিভৎস রূপ নিয়েছিল তার দায় ব্রিটিশ সরকার, সর্বভারতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভাসহ সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল সকল মহলের উপর বর্তায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ঢাকার নওয়াবগণ সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকল সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানকে গুরুত্ব দিতেন। উপরন্তু তাঁরা জনকল্যাণমূলক কাজে যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ঢাকার নওয়াবগণ সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও সংঘর্ষকে উস্কে না দিয়ে শালিসীর মাধ্যমে

মীমাংসা করাকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের এসব দূরদর্শী নীতি বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

তথ্যসূত্র ও টীকা :

১. ঢাকা প্রকাশের মন্তব্য অনুযায়ী ঢাকার নওয়াবগণ সম্মানের দিক থেকে পূর্ববর্তী মুঘল নওয়াবদের চেয়ে কোন দিক দিয়েই পিছিয়ে ছিলেন না। *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ অগ্রহায়ণ ১২৯১ বঙ্গাব্দ (২৪ নভেম্বর ১৮৮৪), পৃ. ৭।

২. হরিদাস ওউমা মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ২৩৩।

৩. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, *ইতিহাস*, ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ৮।

৪. সুফিয়া আহমেদ, *বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় ১৮৮৪-১৯১২*, অনু- সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৩১।

৫. ঢাকার বিশিষ্ট আইনজীবী আনন্দ চন্দ্র রায়ের বাসায় গণ্যমান্য হিন্দু ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভায়নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রস্তাব দেন যে আসামকে বাংলার সাথে যুক্ত করে কোলকাতা হাইকোর্টের অধীনে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হোক। এই প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকা এবং একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে আইন পরিষদের হাতে শাসনভার থাকবে। কিন্তু হিন্দু নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবে সম্মতি দেননি। *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ মাঘ ১৩১১ বঙ্গাব্দ (১৭ জানুয়ারি ১৯০৪), পৃ. ৩।

৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ ই জৈষ্ঠ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ (২৬ মে ১৯০৭)।

৭. *সাধনা*, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২-৬, উদ্ধৃত, ড. মো. আলমগীর, *নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর জীবন ও কর্ম এবং ঢাকার নওয়াব এস্টেট*, ঝিঙেফুল, ঢাকা, ২০১৯ (দ্বিতীয় প্রকাশ), পৃ. ৯৩।

৮. ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মতানৈক্য বঙ্গভঙ্গকালীন সঙ্কট এবং পরবর্তীতে ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র রচনা নিয়ে সৃষ্ট সংকট এবং এ সঙ্কট নিরসনে গৃহীত উদ্যোগ একের পর এক ব্যর্থ হওয়ার পেছনে মূল নেয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

৯. *Census Report of Indi*a, 1921, vol-v, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1913, https://censusindia.gov.in, ড. মো. মাহাবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯০৫-৪৭)*, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৮।

১০. *Census Report of Indi*a, 1911, vol-v, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1913, p-6, https://censusindia.gov.in.

১১. ড. মো. মাহাবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮।

১২. জেমস ওয়াইজ, *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*, অনু-ফওজুল করিম, সম্পা-মুনতাসীর মামুন, সুবর্ণ সংস্করণ, ২০১৪, ঢাকা।

১৩. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭।

১৪. ড. মো. আলমগীর, *আহসান মঞ্জিল ও ঢাকার নওয়াব: ঐতিহাসিক রূপরেখা*, শব্দরূপ, ঢাকা, পৃ. ১৩-১৪।

১৫. 'খাজা' শব্দটি ফার্সি শব্দ যার অর্থ হল মনিব বা নেতা। ধনী ব্যবসায়ীদেরকেও খাজা বলা হত। তবে ড. মো: আলমগীর মনে করেন যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার কারণে ঢাকার নওয়াব পরিবারের কোন আদি পুরুষ হয়ত খাজা উপাধি পেয়েছিলেন এবং তা বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে। খাজা পরিবারের মৌলভী খাজা আবদুল্লাহ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে ঢাকায় বিপুল খ্যাতি লাভ করেন এবং মগবাজার দায়রা শরীফের পীর শাহ নূরীও তাঁর মুরিদ ছিলেন- ড. মো: আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ২০১৪, পৃ. ৭।

১৬. ড. মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১।

১৭. মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

১৮. মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৭, ড. মো. আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস*, পৃ. ১৪।

১৯. ড. মো. আলমগীর, *আহসান মঞ্জিল ও ঢাকার নওয়াব: ঐতিহাসিক রূপরেখা*, শব্দরূপ, ঢাকা, পৃ. ৮০-৮১, মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

২০. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ ই ভাদ্র ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, (৩০ আগস্ট ১৮৯৬), পৃ. ৫-৭।

২১. রতন লাল চক্রবর্তী, *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৬০-৬১, ড. মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-২৯।

২২. সিপাহী বিদ্রোহে খাজা আবদুল গণিসহ আরও যেসব জমিদার ইংরেজদের পক্ষে ছিলেন তাদের মধ্যে রংপুরের রানী স্বর্ণময়ী, পাবনার বিজয় গোবিন্দ চৌধুরি, ভাওয়ালের রাজা কালী নারায়ণ রায়, যশোরের রাজা বরদাকান্ত রায়, চট্টগ্রামের কালিন্দী রানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।- রতন লাল চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৬০, ড. মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

২৩. 'সি এস আই' অর্থ কোম্পনিয়ন অব দি অর্ডার অব দি স্টার অব ইন্ডিয়া। ১৮৮৬ সালে নওয়াব আবদুল গনিকে 'কে সি আই' উপাধী দেয়া হয় যা অর্থ কমান্ডার অব দ্যা অর্ডার অব দি স্টার অব ইন্ডিয়া। মুনতাসীর মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৭, ড. মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩১।

২৪. ড. মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১।

২৫. মো. আলমগীর, ঢাকা নওয়াব পরিবার, *বাংলাপিডিয়া*, bn.banglapedia.org.

২৬. *ঐ*

২৭. *ঐ*

২৮. *ঐ*

২৯. খাজা নাজিমুদ্দিন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার উদ্যোগে ১৯৩০ সালে 'প্রাথমিক শিক্ষা বিল', ১৯৩৫ সালে 'বঙ্গীয় ঋণ সালিশি বোর্ড' এবং ১৯৩৬ সালে 'বঙ্গীয় পল্লী উন্নয়ন বিল' পাসের মত প্রশংসনীয় কাজ সম্পন্ন হলেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তার বিতর্কিত ভূমিকার কারণে ব্যপক সমালোচিত হন। মো. আলমগীর, খাজা নাজিমউদ্দিন, *বাংলাপিডিয়া*, bn.banglapedia.org, ড. মোঃ আলমগীর (সম্পাঃ), *নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর জীবন ও কর্ম*, ঝিঙেফুল,ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ২৩৬।

৩০. বাংলার রেভিনিউ সেক্রেটারি এফ এ সাচে নওয়াবদের এই প্রভাবকে সরকারের জন্য 'গ্রেট হেল্প' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র* ৩, পৃ. ১৩১। বাংলার রাজস্ব সচিব এইচ জে টুইনহ্যামও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঢাকার নওয়াবের গুরুত্বকে তুলে ধরেছিলেন। *Govt. of the Bengal, Grant of a loan to the Nawab of Dacca,* Calcutta, 1927, 1929, উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র* ৩, পৃ. ১৩৩।

৩১. উদাহরণস্বরূপ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কথা উল্লেখ করা যায়। ইংরেজ রাজন্যবর্গের সাথে ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। *সমাচার দর্পণ*, ২০ ডিসেম্বর ১৮২৩, উদ্ধৃত, প্রশান্ত কুমার পাল, *রবি জীবনী*, ১ম খন্ড, www.ebanglalibrary.com

৩১. ড. মোঃ আলমগীর, *আহসান মঞ্জিল ও ঢাকার নওয়াব পরিবার: ঐতিহাসিক রূপরেখা*, শব্দরূপ, ঢাকা, ২০১৬ (৩য় সংস্করণ), পৃ. ৩১।

৩৩. ড. মো. আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস*, পৃ. ৩১।

৩৪. *ঐ*, পৃ. ৩৪।

৩৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ই ভাদ্র ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, (১লা সেপ্টেম্বর ১৮৭২)।

৩৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ শ্রাবণ ১২৮১, (৩ আগস্ট ১৮৭৪), পৃ. ২৭৪ ।

৩৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা ২০০৩ (পুন.), পৃ. ১০৫।

৩৮. *ঐ*

৩৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ জানু ১৮৮৮;ড. মো. আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস*, পৃ. ৩৬।

৪০. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, দ্বিতীয় খন্ড, অন্যন্যা প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৯, পৃ. ১১৪।

৪১. ড. মো. আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস*, পৃ. ৩৬।

৪২. *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ঠা শ্রাবণ ১২৭৬ (১৮ জুলাই ১৮৬৯), ড. মোঃ আলমগীর, *আহসান মঞ্জিল ও ঢাকার নওয়াব পরিবার: ঐতিহাসিক রূপরেখা*, পৃ. ২৭।

৪৩. ড. মো. আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস*, পৃ. ৩৫।

৪৪. ড. মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১২০।

৪৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ ই কার্তিক ১২৯৩ বঙ্গাব্দ (২৬ অক্টেবর ১৮৮৬)।

৪৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ শে ফাল্গুন ১৩১৪ বঙ্গাব্দ (৮ মার্চ ১৯০৮)।

৪৭. ডেপুটেশনের সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– শরৎচন্দ্র, হেমায়েত উদ্দিন, বিনোদ কুমার রায় চৌধুরি, ওবেদুল গনি,মথুরানাথ রায় সেন প্রমুখ। দেখুন– ড. মো. আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫-১২৬।

৪৮. তারা হলেন-বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরি, বাবু মোহিনী মোহন দাস, বাবু অক্ষয় কুমার সেন, বাবু পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বাবু রাধিকা মোহন বসাক ও বাবু ত্রৈলক্য নাথ বসু। *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ শে আশ্বিন ১৩০৩ বঙ্গাব্দ (১১ অক্টোবর ১৮৯৬)।

৪৯. *ঐ*।

৫০. অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমেদ নমশূদ্রদের এই উদ্যোগকে সাধারণ ধারার ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছেন।- সুফিয়া আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

৫১. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ ফাল্গুন ১৩১০ বঙ্গাব্দ (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩) পৃ. ৩।

৫২. ঢাকা প্রকাশ, ৭ শ্রাবণ ১৩১৮বঙ্গাব্দ (৩০ জুলাই ১৯১১), পৃ. ৩।

৫৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ই মাঘ ১২৯৪ বঙ্গাব্দ (৩০ জানুয়ারি ১৮৮৭) ।

৫৪. মুনতাসীর মামুন, *স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ১ম খন্ড, ১৯৯৩, পৃ. ১৭।

৫৫. ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিনটেডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।- ওয়াকিল আহমেদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১৫০, ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, পৃ. ১১১।

৫৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১শে চৈত্র ১২৮৬ বঙ্গাব্দ (৪ এপ্রিল ১৮৮০)।

৫৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ চৈত্র ১২৮৮ (১লা এপ্রিল ১৮৮২), পৃ. ৩১০-১১, মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২, ড. মো. আলমগীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৫৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ঐ।

৫৯. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৯৩।

৬০. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ ই ভাদ্র ১৩০৩ বঙ্গাব্দ (৩০ আগস্ট ১৮৯৬), পৃ. ৫-৭।

৬১. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ শে মাঘ ১২৯১ বঙ্গাব্দ (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫)।

৬২. পত্রটি আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

৬৩. ড. মোঃ আলমগীর, *নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৬৪. সমসাময়িককালের পত্রপত্রিকায় ঈদ-উল আজহাকে বকরা ঈদ নামে অভিহিত করা হত। মুনতাসীর মামুন, *ঈদ উৎসব*, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৪, পৃ. ২৮, ড. মো. আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস*, পৃ. ২৬৮।

৬৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ শ্রাবণ ১৩২১ বঙ্গাব্দ, (১৯ জুলাই ১৯১৪); *ব্রহ্মচারি অক্ষয় চৈতন্য প্রেমানন্দ প্রেমের* কথা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃ-১৭৬-১৭৭, উদ্ধৃত, ড. মো. আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২।

৬৬. *নওয়াব আহসানুল্লাহর ব্যক্তিগত ডায়েরী* (ইংরেজিতে), অপ্রকাশিত, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪, আহসান মঞ্জিলে রক্ষিত, উদ্ধৃত, ড. মো. আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১।

৬৭. ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলে সরকার হাতি সরবরাহ বন্ধ করলে ঢাকার নওয়াবগণ তাদের নিজস্ব হাতি দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। ড. মো. আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১।

৬৮. *নওয়াবদের দানের তালিকা*, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত।

৬৯. *পুরানো নথি*, *প্লেগ ফান্ড*, পৃ. ১৭-১৮, নওয়াব এস্টেট অফিসে রক্ষিত।

৭০. *পুরানো নথি*, *প্লেগ ফান্ড*, পৃ. ১৭-১৮।

৭১. Hridaynath Majumdar, *Reminiscences of Dacca,* Calcutta, 1926, p. 12, ড. মো. আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২।

৭২. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩শে পৌষ ১২৭৩ বঙ্গাব্দ (৬ জানুয়ারি ১৮৬৭), ২০শে বৈশাখ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ (৩ মে ১৮৯৬)।

৭৩. ড. মো. আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

৭৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ (৩০ নভেম্বর ১৯০২)।

৭৫. মো. আলমগীর, *ঢাকার নওয়াব পরিবার*, বাংলাপিডিয়া, bn.banglapedia.org.

৭৬. *দানের তালিকা*, আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে রক্ষিত।

৭৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ৫ চৈত্র ১৩১২ বঙ্গাব্দ (১৯ মার্চ ১৯০৫), পৃ. ৩।

৭৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ মাঘ ১৩২০ বঙ্গাব্দ (১৯ জানুয়ারি ১৯১৩), পৃ. ৩।

৭৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ পৌষ ১৩৩২ বঙ্গাব্দ (৬ জানুয়ারি ১৯২৬), পৃ. ৩।

৮০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৫ জৈষ্ঠ ১৩২০ বঙ্গাব্দ (৮ জুন ১৯১৩), পৃ. ৩।

৮১. *ঢাকা প্রকাশ*, ৮ আষাঢ় ১৩২০ বঙ্গাব্দ (২২ জুন ১৯১৩)।

৮২. ড. মো. আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস*, পৃ. ১৮৫ ।

৮৩. মুহাম্মদ আবু তালিব, নওয়াবজাদী মেহেরবানু, *দৈনিক ইনকিলাব* ২৪ জুন ১৯৯৪।

৮৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ ও ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩১১বঙ্গাব্দ (২০ ও ২৭ নভেম্বর ১৯০৪)।

৮৫. *ঢাকা রায়ট সংক্রান্ত নথি*, ঢাকা নওয়াব এস্টেটে সংরক্ষিত।

৮৬. 'লাল ইশতেহার', 'বিলাতী বর্জন রহস্য' প্রভৃতি নামে কিছু প্রচার পত্রে হিন্দু বিরোধী প্রচারণা চালানো হয়েছিল। হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩।

৮৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০শে আষাঢ় ১৩১৪ বঙ্গাব্দ (১৪ জুলাই ১৯০৭)।

৮৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ চৈত্র ১৩১৪ বঙ্গাব্দ (১৭ মার্চ ১৯০৭), সুফিয়া আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।

৮৯. ১৯০৭ সালের ১২ই মার্চ এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ চৈত্র ১৩১৪ বঙ্গাব্দ (১৭ মার্চ ১৯০৭)।

৯০. ঢাকার বিশিষ্ট আইনজীবী আনন্দ চন্দ্র রায় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ জৈষ্ঠ ১৩১৪ বঙ্গাব্দ (২৬ মে ১৯০৭)।

৯১. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ (২৬ মে ১৯১২), পৃ. ৩।

৯২. ড. মো. আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস*, পৃ. ৪৩।

৯৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ বৈশাখ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (২ মে ১৯২৬)।

৯৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৬ বৈশাখ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (৯ মে ১৯২৬)।

৯৫. *ঢাকা রায়ট সংক্রান্ত গোপন নথি*, পৃ. ৩৩, ঢাকা নওয়াব এস্টেটে রক্ষিত।

৯৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৫ আগস্ট ১৯২৬।

৯৭. *ঢাকা রায়ট সংক্রান্ত গোপন নথি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

৯৮. *ঐ*

৯৯. *ঐ*

১০০. ড. মো: আলমগীর, *মুসলিম বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাস*, পৃ. ৪৫।

১০১. শাঁখারী বাজারের কাছে এক মুসলিম গাড়িওয়ালার চাকায় পিষ্ট হয়ে এক হিন্দু বালিকা আহত হয়। অসাবধানতাবসত ঘটা এই দূর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভয়ানক দাঙ্গা বাধে। শাঁখারী বাজারের একটি মসজিদে হিন্দুগণ হামলা চালায়। ঢাকা রায়ট সংক্রান্ত নথি, পৃ. ১১-১২।

১০২. ড. মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।

১০৩. *ঐ*

১০৪. *মাসিক মোহাম্মদী*, ৩ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, পৃ. ৭৯৭-৯৮।

১০৫. ড. মো: আলমগীর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬।

১০৬. *Amrita Bazaar Patrika,* 13 June 1930, উদ্ধৃত, ঢাকা রায়ট সংক্রান্ত নথি, পৃ. ২৫।

১০৭. ঢাকা রায়ট সংক্রান্ত নথি, পৃ. ২৪।

১০৮. নওয়াবদের দানের তালিকায় সাঁওতালদের দানের কথা উল্লেখ আছে।